Journal of Sociology
Vol. 14 Issue 1 & 2, 2023
ISSN: 1813-2871

Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka

বৌদ্ধ শিল্পকলার উদ্ভব ও বিকাশে রাজবংশের অবদান সমীক্ষা: বুদ্ধযুগ থেকে গুপ্তযুগ

(A Study on the Dynastic Contributions to the Origin and Development of Buddhist Arts: Buddha Age to Gupta Age)

ড. শান্টু বড়ুয়া*

সারসংক্ষেপ

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ শিল্পকলার উদ্ভব ঘটে। যুগ পরিক্রমায় বিভিন্ন রাজবংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীদের মননশীল সাধনায় বৌদ্ধ শিল্পকলার ভাণ্ডার নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বুদ্ধের জীবন-দর্শন বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও এতে প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে অনুসন্ধান করা যায়। এ কারণে বৌদ্ধ শিল্পকলার নানান নিদর্শনকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার অমূল্য উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বুদ্ধযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত সময়ে প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করেন। এই প্রবন্ধে বৌদ্ধ শিল্পকলার সূচনা ও বিকাশে কোন রাজবংশ কীভাবে অবদান রাখেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত, হর্যঙ্ক, মৌর্য, শুঙ্গ, ইন্দো-গ্রীক, কুষাণ, সাতবাহন, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশের অবদান বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ: বিহার, স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য, গুহামিন্দর, বেলুবন, হর্যঙ্ক, মৌর্য, শুঙ্গ, ইন্দো-গ্রীক, কুষাণ, সাতবাহন, গুপ্ত, গান্ধার, মথুরা, অশোক, সাঁচীস্তূপ, ভরহুতস্তূপ, মিলিন্দ, কণিষ্ক, সারনাথ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী।

Abstract

Buddhist arts originated based on the life and philosophy of Gautama Buddha. Through the ages, the storehouse of Buddhist arts became enriched in various ways with the patronage of kings of different dynasties and the thoughtful pursuit of artists from different regions. Although Buddha's life and philosophy are the main subjects of Buddhist arts, various elements of contemporary Indian society, such as culture, education, art, historical traditions and many more can be found in it. For this reason, various artifacts of Buddhist arts are considered as invaluable sources for the history of ancient India. Ancient India was ruled by various dynasties from the Buddha's period to the Gupta era. This article

---

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
E-mail: shantubarua@du.ac.bd

DOI:

sheds light on how each dynasty contributed to the initiation and development of Buddhist arts. In particular, the contributions of the Haryanka, Maurya, Sunga, Indo-Greek, Kushan, Satavahana, Gupta and other dynasties are specially reviewed.

১. ভূমিকা

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের ঘটনাবহুল জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিল্পকলার উদ্ভব ঘটে। কালক্রমে বিভিন্ন শিল্পীর সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ও নৈপুণ্যতায় তা নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে এবং যুগ পরিক্রমায় বিভিন্ন রাজবংশের রাজাদের পৃষ্টপোষকতায় বৌদ্ধ শিল্পকলা বৈচিত্র্যময় রূপ পরিগ্রহ করে। ঐ সকল বৈচিত্র্যময় বৌদ্ধ শিল্পকলাকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : স্থাপত্যিক শিল্প, মূর্তিশিল্প এবং চিত্রশিল্প। বিহার, স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য, গুহামন্দির প্রভৃতি স্থাপত্যিক শিল্পের অন্তর্গত। মূর্তি এবং চিত্রকলা দু'টি স্বতন্ত্র ধারার শিল্পকলা হিসেবে গণ্য করা হয়। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজা ও রাজন্যবর্গগণ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এবং নিজেদের কর্মাবলী ও গৌরবগাথা স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ শিল্পকলা নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কালক্রমে সেসব শিল্প নিদর্শন ইতিহাসের অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারে পরিণত হয়। বুদ্ধযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ শিল্পকলার উদ্ভব ও বিকাশে বিভিন্ন রাজবংশের অবদান পর্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২. বৌদ্ধ শিল্পকলার উদ্ভব ও বিকাশে বিভিন্ন রাজবংশের অবদান

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ শিল্পকলার সূচনা বুদ্ধযুগেই (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায় বুদ্ধযুগে মগধরাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু, কোসলরাজ প্রসেনজিত, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ করে দান করেন। কালের বিবর্তনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এ বিহারগুলোকেই প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বৌদ্ধ শিল্পকলার আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করেন। এছাড়া কোসলরাজ প্রসেনজিতের সময়কালেই বুদ্ধের একটি স্বর্ণমূর্তি নির্মিত হয় বলে বৌদ্ধ সাহিত্য এবং চৈনিক ঐতিহ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ধারণা করা যায় বৌদ্ধ শিল্পকলার সূত্রপাত গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালেই সূচিত হয়। বৌদ্ধ শিল্পকলার গোড়াপত্তন বুদ্ধযুগে হলেও এর বিবর্তন ধারা মৌর্য, শুঙ্গ, ইন্দো-গ্রীক, কুষাণ, সাতবাহন, গুপ্ত, এবং পাল আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মূলত উপর্যুক্ত সময়ে বিভিন্ন রাজ পরিবার এবং অভিজাত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকর্ম সৃষ্টি হয়েছিল যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের গৌরব বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এসব শিল্পকর্মের সাথে ধর্মীয় আবেগ বিশেষভাবে জড়িত। ইতিহাসের অমূল্য উপাদান খ্যাত এসব শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে যেসব রাজন্যবর্গ, শ্রেষ্ঠী কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে অবদান রাখেন তাঁদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কর্মকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

২.১. বুদ্ধ সমসাময়িক রাজন্যবর্গের অবদান

বুদ্ধের সমসাময়িক রাজবংশের অনেক রাজা, শ্রেষ্ঠী ও অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি তাঁরা নান্দনিক বৌদ্ধ শিল্পকলা নির্মাণেও অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: রাজা বিম্বিসার, রাজা অজাতশত্রু, রাজা প্রসেনজিৎ, রাজা চণ্ড প্রদ্যোত, রাজা উদয়ন, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক, রানী মল্লিকা এবং শ্রেষ্ঠীকন্যা বিশাখা প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নাম স্মতর্ব্য।

২.১.১. হর্যঙ্ক রাজবংশ: রাজা বিম্বিসার ও রাজা অজাতশত্রু

২.১.১.১. রাজা বিম্বিসার (খ্রি: পূ: ৫৪৫-৪৯২)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রাচীন ভারত ষোলটি মহাজনপদে বিভক্ত ছিল এবং বিভিন্ন রাজবংশ ও রাজা কর্তৃক শাসিত হতো (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২:১১৩)। তন্মধ্যে অন্যতম ছিল ছিল মগধ। মগধের সাথে বৌদ্ধধর্মের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব-বিকাশের মূল কেন্দ্রস্থল ছিল মগধ। যে তিনটি স্থানে সঙ্গীতি বা সম্মেলনের মাধ্যমে বুদ্ধবাণী বা ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছিল সে স্থানসমূহ ছিল মগধে। বুদ্ধের আবির্ভাবকালে হর্যঙ্কবংশ মগধে রাজত্ব করতেন। রাজা বিম্বিসার ছিলেন হর্যঙ্ক বংশের একজন প্রখ্যাত রাজা। ত্রিপিটক এবং সিংহলি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য দীপবংস ও মহাবংস সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ এবং রাজা বিম্বিসার ছিলেন সমসাময়িক। রাজা বিম্বিসারের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম মগধ এবং উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। এছাড়া, মহাবংস গ্রন্থে বুদ্ধের পরিবার এবং রাজা বিম্বিসারের পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলে উল্লেখ আছে।

বিনয় পিটকে উক্ত আছে, বুদ্ধত্ব লাভের দ্বিতীয় বর্ষে বুদ্ধ মগধের রাজধানী রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলে মগধরাজ বিম্বিসার বসবাসের জন্য 'বেলুবন' নামক একটি বিহার নির্মাণ করে দান করেন। উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম বিহার, যা রাজা বিম্বিসারের অমর কীর্তি। সংযুক্ত নিকায়, সুত্তনিপাত অট্ঠকথা, সামন্তপাসাদিকা এবং দিব্যাবদান গ্রন্থের সাক্ষ্য মতে, ঘন বাঁশবন দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে এই মনোরম বিহারের নামকরণ করা হয় বেলুবন। উল্লেখ্য যে, পালি 'বেলু' শব্দের বাংলা অর্থ বাঁশ। বিহারটি ১৮ কিউবিটস সুউচ্চ দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। বিহারটিতে সুসজ্জিত তোরণদ্বার এবং উঁচু অট্টালিকা ছিল বলেও উল্লেখ পাওয়া যায় (Smith, 1916:49; Takakusu and Nagai, 1968:576; Law, 1954:270)। প্রত্নতত্ত্ববিদ সাধন চন্দ্র সরকার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন,

> "বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে অদ্যাপি উল্লিখিত প্রাচীরের ঈষৎ ধ্বংসাবশেষ এবং চারিকোণে অবস্থিত পর্যবেক্ষণী-অট্টালিকার (Watch-Tower) ভিতের অবস্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায়" (সরকার, ১৯৯৭:১৭৭)

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ বিহারটির গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধ তাঁর প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তদশ ও বিংশতি বর্ষাবাস এ বিহারেই উদ্‌যাপন করেন। এখানে অবস্থানকালেই তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিচালনার জন্য বিনয়ের বহু বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন। এছাড়া, অনেক তাত্ত্বিক বিষয়ের ধর্মদেশনা এবং বহু জাতক ভাষণ করেন। বিনয় পিটকে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক তথা অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়ন উক্ত বিহারেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মগধেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মগধেই তাঁদের দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল (Oldenberg, 1879: 39-42; Chaudhury, 1982:100)। বিহারটি মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিকটবর্তী কলন্দক-নিবাপ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ কলন্দক-নিবাপকে করণ্ডবেণুবন আখ্যায়িত করে এর অবস্থান রাজগৃহের এক লি উত্তরে ছিল বলে নির্দেশ করেন (Beal, 1869:159)। বর্তমানে ভারতের বিহার রাজ্যের রাজগৃহের দক্ষিণে প্রাচীন বেলুবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ স্থানে নব নির্মিত বিহার লক্ষ করা যায়। বুদ্ধ, তাঁর অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ন, রাজা বিম্বিসার ও রাণী ক্ষেমার নানা আখ্যান ও স্মৃতিতে বেলুবন বিহার অবিস্মরণীয়।

২.১.১.২. রাজা অজাতশত্রু (খ্রিঃ পূঃ ৪৯৩-৪৬২)

মগধরাজ অজাতশত্রু ছিলেন বিম্বিসারের পুত্র এবং হর্যঙ্ক বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর রাজত্বকালেই হর্যঙ্ক বংশের শক্তি ও গৌরব উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছিল। মনে করা হয় তিনিই প্রথম নৃপতি যিনি ভারতবর্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যসীমা বারাণসী থেকে বঙ্গদেশের সীমান্তবর্তী গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন (হালদার, ১৯৯৬:৩৬)। পিতার মতো তিনিও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন না। পিতৃ হত্যার অনুশোচনা এবং রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শে দীক্ষিত হন বৌদ্ধধর্মে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের এক বছর পূর্বেই তিনি হয়ে উঠেন বুদ্ধের প্রধান ভক্ত (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৯:৫২; Malalasekera, ১৯৯৮:৩৩)। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণার্থে তিনি বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজা অজাতশত্রু এবং বুদ্ধের কথোপকথনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উভয়ের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে “শ্রামণ্য ফল প্রশ্ন” এবং “সংশয় নিরাকারক” সূত্রদ্বয় সংকলিত হয়, যা বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ সূত্র হিসেবে খ্যাত।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বৌদ্ধ সংগীতিসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগীতির মাধ্যমে ভিক্ষুসংঘ সম্মিলিত হয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বুদ্ধবাণী সংকলন ও পরিমার্জন করেন (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০০০:১৫)। রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির আয়োজন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যেটি ‘থেরবাদ সংগীতি’ নামে পরিচিত। এ সংগীতির মাধ্যমে সর্বপ্রথম বুদ্ধবাণীসমূহ সংকলিত হয়েছিল। উক্ত সংগীতিতে ধর্ম বিনয়ে পারদর্শী পাঁচশত ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন এবং সাত মাস সংগীতির কার্যক্রম চলমান ছিল। উক্ত সংগীতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন রাজা অজাতশত্রু। অজাতশত্রু তাঁর ৩২ বছরের শাসনামলে বিভিন্ন বিহার সংস্কারসহ একাধিক স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করেন। পালি অঙ্গুত্তর নিকায় এবং মহাবংস গ্রন্থে (শ্লোক নং- ৩২, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) উল্লেখ আছে, রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন (Morris, 1888:182; Geiger, 1908:15)। জানা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর দেহভস্ম নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা স্তূপ নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ স্তূপের ইতিবৃত্ত নিয়ে পালি ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ থূপবংসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। থূপবংস মতে, বুদ্ধের পবিত্র দেহভস্ম তৎকালে প্রভাবশালী নিম্নোক্ত রাজা এবং গোষ্ঠী প্রধানদের কাছে হস্তান্তর করা হয় (Jayawickrama, 1971:179-180)।

ক্রমিক	রাজ্য/অঞ্চলের নাম	রাজা/রাজ প্রতিনিধি/ গোষ্ঠীর নাম	ক্রমিক	রাজ্য/অঞ্চলের নাম	রাজা/রাজ প্রতিনিধি/ গোষ্ঠীর নাম
১	কুশীনগর	মল্লগণ	৫	অল্লকপ্পবাসী	বুলিগণ
২	মগধ	রাজা অজাতশত্রু	৬	রামগ্রাম	কৌলিয়গণ
৩	বৈশালী	লিচ্ছবীগণ	৭	পাবা	মলগণ
৪	কপিলাবস্তু	শাক্যগণ	৮	বেটদ্বীপ	ব্রাহ্মণগণ

পরবর্তীতে রাজা বা রাজ প্রতিনিধি বা গোষ্ঠী প্রধানগণ নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা সহকারে বুদ্ধের পবিত্র দেহভস্ম স্তূপে সংরক্ষণ করেন। বিভিন্ন রাজ্যে স্তূপ নির্মাণের কথা ত্রিপিটকেও উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি দীর্ঘনিকায় এবং বুদ্ধবংস নামক গ্রন্থদ্বয়ে শাক্যজনপদ কপিলাবস্তুতে বুদ্ধের দেহভস্ম সম্বলিত একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ আছে (Davids and Carpenter 1903:167)। থূপবংস গ্রন্থে রাজা অজাতশত্রু কতৃর্ক রাজগৃহে বুদ্ধের পবিত্র দেহভস্ম সম্বলিত স্তূপ নির্মাণের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। মগধরাজ অজাতশত্রু সুসজ্জিত

শোভাযাত্রা সহযোগে রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনী, উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিরাপত্তা পরিষদ এবং স্বেচ্ছাসেবক দল দ্বারা পরিবৃত হয়ে বুদ্ধের দেহভস্ম সোনার পাত্রে স্থাপনপূর্বক রাজগৃহে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা অজাতশত্রু ভক্তদের পূজা-অর্ঘ্য নিবেদনের সুবিধার্থে রাজগৃহে বুদ্ধের পবিত্র দেহভস্মের উপর একটি সুসজ্জিত স্তূপ নির্মাণ করেন। পালি দীর্ঘনিকায়ের অট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনি গ্রন্থেও অভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় (Stede, 1931:610)। থূপবংস এবং ধম্মপদট্ঠকথা নামক গ্রন্থদ্বয়ে আরো উল্লেখ আছে, রাজা অজাতশত্রু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মহাকাশ্যপ স্থবিরের পরামর্শে অষ্ট মহাস্থানে সংরক্ষিত বুদ্ধের দেহভস্মসমূহ সংগ্রহ করেন এবং রাজগৃহে সংগৃহীত দেহভস্মের উপর স্তূপ নির্মাণ করেন। থূপবংস গ্রন্থ হতে রাজা অজাতশত্রু কতৃর্ক স্তূপ নির্মাণ কাহিনীর চুম্বকাংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

> অসীতিহত্থগম্ভীরে পন তস্মিং পদেসে জাতে হেট্ঠা লোহসন্থরং সন্থরাপেত্বা তত্থ থূপারামে চেতিযঘরপ্পমাণং তম্বলোহমযং গেহং কারাপেত্বা অট্ঠ'ট্ঠ হরিচন্দনাদিমযে করণ্ডে চ থূপেচ কারাপেসি। অথ খো ভগবতো ধাতুযো হরিচন্দনকরণ্ডে পক্খিপিত্বা তং হরিচন্দনকরণ্ডং অঞ্ঞস্মিং হরিচন্দনকরণ্ডে তম্পি অঞ্ঞস্মিন তি এবং অট্ঠা হরিচন্দনকরণ্ডে একতো কত্বা এতেনেব উপাযেন অট্ঠা করণ্ডে অট্ঠসু হরিচন্দনথূপেসু অট্ঠ হরিচন্দনথূপে অট্ঠসু লোহিতচন্দনকরণ্ডেসু অট্ঠ লোহিতচন্দনকরণ্ডে অট্ঠসু লোহিতচন্দনথূপেসু অট্ঠ লোহিতচন্দনথূপে অট্ঠসু দন্তকরণ্ডেসু অট্ঠ দন্তকরণ্ডে অট্ঠসু দন্তথূপেসু অট্ঠ দন্তথূপে অট্ঠসু সব্বরতনকরণ্ডেসু অট্ঠ সব্বরতনকরণ্ডে অট্ঠসু সব্বরতনথূপেসু অট্ঠ সব্বরতনথূপে অট্ঠসু সুবণ্ণকরণ্ডেসু অট্ঠ সুবণ্ণকরণ্ডে অট্ঠসু সুবণ্ণথূপেসু অট্ঠ সুবণ্ণথূপে অট্ঠসু রজতকরণ্ডেসু অট্ঠ রজতকরণ্ডে অট্ঠসু রজতথূপেসু অট্ঠ রজতথূপে অট্ঠ মণিকরণ্ডেসু অট্ঠ মণিকরণ্ডে অট্ঠসু মণিথূপেসু অট্ঠ মণিথূপে অট্ঠসু লোহিতঙ্ককরণ্ডেসু অট্ঠ লোহিতঙ্ককরণ্ডে অট্ঠসু লোহিতঙ্কথূপেসু অট্ঠ লোহিতঙ্কথূপে অট্ঠসু মসারগল্লথূপেসু অট্ঠ মসারগল্লথূপে অট্ঠ মসারগল্লকরণ্ডেসু অট্ঠ মসারগল্লকরণ্ডে অট্ঠসু ফলিককরণ্ডেসু অট্ঠ ফলিককরণ্ডে অট্ঠসু ফলিকথূপে পক্খিপি (Jayawickrama, 1971:181-182)।

অর্থাৎ, রাজা মাটির আশি হাত নীচ পর্যন্ত খনন করিয়ে গর্তের তলায় চাদরের মতো লোহার মোটা পাটাতন বিছালেন। এর উপরিভাগে তৈরি করালেন একটি সুপরিসর তামার গর্ভাগার। সে গর্ভাগারে বুদ্ধের দেহাবশেষসমূহ রাখা হয় আটটি হলুদ রঙের চন্দনকাঠে নির্মিত ঢাকনিযুক্ত ছোট পাত্রে। হলুদ রঙের চন্দনকাঠের আটটি পাত্র আবার পৃথকভাবে রাখা হয় আটটি লাল চন্দনকাঠের পাত্রের মধ্যে। সে আটটি পাত্রকে পুনরায় রাখা হয় আটটি হস্তিদন্তে নির্মিত পাত্রে। সে আটটি পাত্রকে আবার মণিমুক্তাখচিত পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। মণিমুক্তা খচিত পাত্রগুলো আবার রাখা হয় সোনার আটটি পাত্রে। সোনার পাত্রগুলো আবার আটটি রূপার পাত্রে রাখা হয়। রূপার পাত্রগুলো পুনরায় রাখা হয় পদ্মরাগমণিতে নির্মিত আটটি পাত্রে। এ পাত্রগুলো আবার রাখা হয় বৈদুর্যমণিতে নির্মিত আটটি পাত্রে। এরপর এসব পাত্রকে পুনরায় স্ফটিক নির্মিত পাত্রে রাখা হয়। এভাবে বিভিন্ন উপাদানে পাত্র তৈরি করে সেখানে বুদ্ধের দেহাবশেষ রাখা হয়।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্তেও রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক স্তূপ নির্মাণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় (Watters, 1996:158-159)। স্তূপটির অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কারো মতে, বর্তমান বিহার রাজ্যের রাজগীরিতে অবস্থিত মণিয়ার মঠে স্তূপটি অবস্থিত ছিল। আবার কারো মতে, বর্তমান রাজগীরের জাপানি বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখস্থিত উঁচু ঢিবিই ছিল স্তূপটির অবস্থান স্থল (সরকার, ১৯৯৭:১৭৬)।

২.১.২. কোসল রাজবংশ: রাজা প্রসেনজিৎ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠী

২.১.২.১. রাজা প্রসেনজিৎ (খ্রি: পূ: ৬ষ্ঠ শতক)

ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম কোশলরাজ্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। কোসল রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে সুমতি, দক্ষিণে সর্পিকা বা স্যন্দিকা বা সই নদী, পূর্বে সদানদী এবং উত্তরে নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে জানা যায় (হেমচন্দ্র, ১৯৮৯:৮৯)। বুদ্ধের সময়ে কোসল রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। তিনি রাজা বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর ন্যায় বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্টপোষক এবং বুদ্ধের একান্ত ভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর একাধিক পত্নীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। প্রধান মহিষী ছিলেন মল্লিকা। তাঁর অপরাপর মহিষীরা হলেন মগধরাজ বিম্বিসারের ভগিণী কোসলদেবী, শাক্যবংশীয় বাসব ক্ষত্তিয়া, উব্বিরী প্রমুখ। তাঁরা সবাই নিজ নিজ কর্মাবদানের জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে স্মরণীয়। রাজা প্রসেনজিৎ বিহার নির্মাণ, বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার এবং ভিক্ষুসংঘের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি কর্মাবদানের জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। জাতক, থেরীগাথা অট্ঠকথা, সুত্তনিপাত, অঙ্গুত্তরনিকায়, সংযুক্তনিকায় এবং বিনয়পিটক থেকে জানা যায়, বুদ্ধ ধর্ম প্রচার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন কোসলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে। তিনি শ্রাবস্তীতে পঁচিশবার বর্ষাবাস পালন করেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ ও তাঁর সংঘের শিষ্যদের বসবাসের জন্য রাজা প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তীতে রাজাকারাম বিহার নির্মাণ করেন। বুদ্ধ এ বিহারেও বর্ষাবাস উদ্যাপন করেন। সুমনা ভিক্ষুণী ছিলেন এ বিহারটির প্রধান তত্ত্বাবধায়িকা (সরকার, ১৯৯৭:১৯৮)। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিহারটি রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক নির্মিত বলে উল্লেখ করলেও, এটি ভিক্ষুণীদের জন্য বিশেষত মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে অভিমত পোষণ করেন (Watters, 1996:377)। রাজা প্রসেনজিতের আরেক অমর কীর্তি হলো বুদ্ধের স্বর্ণ মূর্তি নির্মাণ। চৈনিক ঐতিহ্য মতে, রাজা প্রসেনজিতের পূর্বে রাজা উদয়ন প্রথম চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত ঐতিহ্যে উল্লেখ আছে যে, স্বর্গীয় মাতাকে ধর্ম দেশনার নিমিত্ত বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। তাবতিংস স্বর্গে তিনি তিন মাস অবস্থান করেন। রাজা উদয়ন বুদ্ধকে দীর্ঘদিন দর্শন করতে না পেরে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন অমাত্যগণ আলাপ-আলোচনাপূর্বক দক্ষ কারিগর দ্বারা বুদ্ধের চন্দন কাষ্ঠের একটি মূর্তি নির্মাণের জন্য রাজা উদয়নকে পরামর্শ দান করেন। অমাত্যগণের পরামর্শক্রমে রাজা উদয়ন ৫ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চন্দন কাষ্ঠের একটি বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করান। এ খবর শুনে রাজা প্রসেনজিৎও বুদ্ধের স্বর্ণ নির্মিত একটি মূর্তি নির্মাণ করান (Takakusu, 1924-34:706-707)। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্তেও রাজা প্রসেনজিতের বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। দু'জনেরই ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে যে, শ্রাবস্তীতে রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তি জনগণকে শ্রদ্ধা সহাকারে পূজা করতে দেখেছেন (Watters, 1996:368, 384.)।তবে বুদ্ধমূর্তি নিমাণ প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

২.১.২.২. শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক (খ্রি: পূ: ৬ষ্ঠ শতক)

অনাথপিণ্ডিক ছিলেন কোসল রাজ্যের শ্রেষ্ঠী। তিনি ছিলেন শ্রাবস্তীর অধিবাসী। তাঁর গৃহী নাম ছিল সুদত্ত। পালি সাহিত্য পাঠে জানা যায় সুদত্ত অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কোনো দরিদ্র, অনাথ বা ভিখারি তাঁর গৃহ থেকে কখনো খালি হাতে ফিরে যেতেন না। তিনি দরিদ্র ও অনাথের অন্নদাতা ছিলেন বলে তিনি খ্যাত হন 'অনাথপিণ্ডিক' নামে। মজ্ঝিম নিকায়ের অট্ঠকথা পপঞ্চসূদনী এবং উদান অট্ঠকথায় উল্লেখ আছে, অনাথপিণ্ডিক কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে শ্রাবস্তীতে জেতবন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করেন (Woods & Kosambi, 1922:50; Woodward, 1926:56.)। বিহার দানের এ ঘটনা

ভরহুত শিল্পের একটি মেডালিয়ানেও উৎকীর্ণ আছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ বিহার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ত্রিপিটকে এই বিহারের নাম বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। ধম্মপদট্ঠকথা, বুদ্ধবংস অট্ঠকথা, অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্ঠকথা মনোরথপূরণী প্রভৃতি গ্রন্থ হতে জানা যায় বুদ্ধ সর্বমোট ঊনিশটি বর্ষাবাস এ বিহারে উদযাপন করেন (Norman, 1906:4; Horner, 1946:3; Walleser, 1924:314)। বুদ্ধ এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এ বিহারেই দীক্ষিত হন। সুপরিকল্পিত ও নান্দনিক বিহার স্থাপত্যের অন্যন্য নিদর্শন হলো অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহার। বিহারটি সুবিশাল সম্মেলন কক্ষ, ভিক্ষুসংঘের বসবাসের কক্ষ, উপাসনাগৃহ, কূপ, স্নানাগার, দেশনা মঞ্চ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল (Law, 1954:87)।

সংস্কৃত দিব্যাবদান গ্রন্থে উল্লেখ আছে মহামতি সম্রাট অশোক পাঁচটি বৃহৎ ইমারত সমন্বিত জেতবন বিহার পরিদর্শন করেন (সরকার, ১৯৯৭:১৯৭)। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন বিহারটি সাতটি অংশে বিভক্ত ছিল বলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, নানা ধরনের নৈবেদ্য, কারুকার্যময় ধ্বজা, শামিয়ানা প্রভৃতি দ্বারা বিহারটি পরিপূর্ণ থাকত। হিউয়েন সাঙ খ্রিষ্ট্রীয় সপ্তম শতকে ভারত ভ্রমণে এসে জেতবন বিহার পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখেন বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি এ বিহারের অতীত ঐতিহ্যের কথা এবং বিহারের আয়তন সম্পর্কে নানান তথ্য তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন। উক্ত তথ্য মতে, বিহারের আয়তন ছিল ৮০ চিঙ বা প্রায় ১৩০ বর্গ একর। আরেক তথ্য মতে, আয়তন ছিল ১০ লি বা দুই মাইল। যেখানে ছিল উপাসনা কক্ষ, ধ্যান-সাধনার কক্ষ, ভিক্ষুসংঘের আবাসকক্ষ, স্নানাগার, চিকিৎসালয়, স্বচ্ছ পানির কূপ প্রভৃতি। এছাড়া, একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার ছিল। পাঠাগারটি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিক ধর্ম-দর্শনের পুস্তক ছাড়াও সমকালীন শিল্পকলা, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকে ভরপুর ছিল (Watters, 1996:386)। বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের গোন্ডা জেলার সাহেট-মাহেট নামক স্থানকে বিহারটি অবস্থান স্থল হিসেবে শনাক্ত করা হয়। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে স্যার আলেকজেন্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে সাহেট ও মাহেট অঞ্চলে ব্যাপক খনন কার্য চালানো হয়। ফলে মৌর্য, গুপ্ত ও কুষাণযুগের বিভিন্ন স্থাপত্য ও মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এ কারণে ধারণা করা হয় বুদ্ধের সময়ে এ বিহার নির্মিত হলেও বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান হওয়ায় বুদ্ধ পরবর্তী অনেক রাজবংশ এ বিহারের উন্নয়নে অবদান রাখেন। অপূর্ব স্থাপত্যশৈলির নিদর্শন জেতবন বিহারের কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনাথপিণ্ডিকের নাম অমর হয়ে আছে।

২.১.২.৩. শ্রেষ্ঠীকন্যা বিশাখা (খ্রি: পূ: ৬ষ্ঠ শতক)

বৌদ্ধ ইতিহাসে মহা-উপাসিকা নামে খ্যাত বিশাখা ছিলেন মগধের ভদ্দীয় নগরের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং শ্রাবস্তীর মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধু। বিশাখার শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী ছিলেন নিগ্রন্থ নাথপুত্র তথা আজীবিক ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু বিশাখা ছিলেন বুদ্ধের ধর্মের অনুসারী। বিশাখার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মিগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে এবং বিশাখার কল্যাণে মিগার শ্রেষ্ঠী জ্ঞানচক্ষু লাভ করেছিলেন বিধায় তিনি তাঁকে মাতৃ সম্বোধন করতেন। এ কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশাখা 'মিগার মাতা' নামেও পরিচিত। ধম্মপদট্ঠকথায় উল্লেখ আছে, বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে বিশাখা তাঁর শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠীকে সাথে নিয়ে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে প্রতিদিন মহা দানকার্য সম্পাদন করতেন। বুদ্ধশিষ্য মোগ্গল্লায়ন স্থবিরের তত্ত্বাবধানে বিশাখা কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবস্তীর পূর্বপ্রান্তে 'পূর্বারাম বিহার' নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। বিনয়পিটকে উল্লেখ আছে, দ্বিতল বিশিষ্ট বিহারটিতে প্রায় সহস্র কক্ষ ছিল (Chaudhury, 1982:74)। তৎকালীন প্রসিদ্ধ জেতবন বিহারের পূর্ব পাশে এ বিহারের অবস্থান ছিল বলে এ বিহারের নামকরণ করা হয় পূর্বারাম। চৈনিক পরিব্রাজক

ফা-হিয়েন এ বিহারের অবস্থান উল্লেখ করেন জেতবন বিহারের ছয় বা সাত লি উত্তর-পূর্বে (Watters, 1996:400)। বর্তমান উত্তর-ভারতের সাহেট-মাহেট স্থানেই উক্ত বিহার অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ বিহারে বুদ্ধ ছয়টি বর্ষাবাস পালন করেন এবং এ বিহারে বুদ্ধ অগ্গঞ্ঞ (দীর্ঘনিকায়), উট্ঠান (সুত্তনিপাত), অরিয়পরিয়েসণ, গণকমোগ্গলানসুত্ত (মজ্ঝিমনিকায়), পাসাদকম্পন (সংযুক্তনিকায়), বিঘাসজাতক প্রভৃতি সূত্র ভাষণ করেন। ত্রিপিটকের সূত্রসমূহের মধ্যে বুদ্ধ কোন অঞ্চলে কয়টি সূত্র দেশনা করেন এ সম্পর্কে ওডওয়ার্ড (Woodward) বিস্তর গবেষণা করেন। মালালাসেকেরা (Malalasekera) উক্ত গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

> "বুদ্ধ চতুর্নিকায়ের ৮৭১টি সূত্র শ্রাবস্তীতে, ৮৪৪টি সূত্র জেতবনে, ২৩টি পূর্বারামে এবং ৪টি শহরাঞ্চলে ভাষণ করেন। সূত্রসমূহের মধ্যে ৬টি দীর্ঘনিকায়ে, ৭৫টি মজ্ঝিমনিকায়ে, ৭৩৬টি সংযুক্তনিকায়ে এবং ৫৪টি অঙ্গুত্তরনিকায়ে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।" (Malalasekera, 1998:1127)

২.২. বুদ্ধ পরবর্তী রাজন্যবর্গের অবদান

বুদ্ধ পরবর্তী যেসব রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পকলার অভূতপূর্ব প্রচার-প্রসারের অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিশুনাগ রাজবংশ, মৌর্য রাজবংশ, শুঙ্গ রাজবংশ, ইন্দোগ্রীক রাজবংশ, কুষাণ রাজবংশ, সাতবাহন রাজবংশ, গুপ্ত রাজবংশ, পাল রাজবংশ। শিশুনাগবংশ ছাড়া অন্যান্য রাজন্যবর্গের সময়কালে বৌদ্ধ শিল্পকলার ব্যাপক চর্চা পরিলক্ষিত হয়। শিশুনাগের পুত্র কালাসোক বা কাকবর্ণ দ্বিতীয় সংগীতির আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। পরবর্তীতে শিশুনাগবংশের রাজা শূরসেন ও রাজা মহাপদ্মনন্দ বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে এ সময়ের কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ শিল্পকলায় বুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন রাজন্যবর্গের অবদান নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

২.২.১. মৌর্য রাজবংশ: সম্রাট অশোক (খ্রি: পূ: ২৭৩-২৩২ অব্দ)

ভারতের ইতিহাসে মৌর্যদের আবির্ভাব ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হতে। মৌর্যবংশের প্রথম সম্রাট ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪-৩০০ অব্দ)। তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন কিনা তার কোনো সঠিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তাঁর সময়ে গ্রীক রচনাবলীতে বৌদ্ধ শ্রামণ-ভিক্ষুদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় (Mookerji, 1943:299-302)। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করে সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের তথ্য পাওয়া গেলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। মৌর্যরাজবংশের তৃতীয় সম্রাট ছিলেন অশোক। সিংহলী ঐতিহাসিক ঐতিহ্য মহাবংস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বিন্দুসারের শতাধিক পুত্রের মধ্যে অশোক ছিলেন সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, বলবান এবং ঋদ্ধিসম্পন্ন (বড়ুয়া ও তালুকদার: ২০১১:৬৮)। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে অশোক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তিনি ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান সম্রাট। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সম্রাট আশোক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ এবং বুদ্ধের প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বধর্মে রূপায়ন, চিরস্থিতি এবং অনুব্যঞ্জনা দানে সমৃদ্ধ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বৌদ্ধধর্মে তাঁর অবদান এক নজরে নিম্নরূপ:

- তৃতীয় সংগীতির আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা।
- ত্রিপিটক সংকলন।

- ভিক্ষুসংঘকে বিশুদ্ধিকরণ।
- বৌদ্ধধর্মের প্রচারের নিমিত্ত বহির্ভারতের নয়টি স্থানে ধর্মদূত প্রেরণ।
- চুরাশি হাজার স্তুপ প্রতিষ্ঠা।
- বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিভ্রমণ এবং ধর্মবাণী সম্বলিত স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা।
- চৈত্য-বিহার সংস্কার, বুদ্ধের জীবন কাহিনী চিত্রায়নপূর্বক স্তুপ সজ্জিত করণ ইত্যাদি।
- বুদ্ধবাণীর মর্মকথার আলোকে অনুশাসন প্রচার।

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাসে সম্রাট অশোকের অমর কীর্তি বা নিদর্শন হলো বৌদ্ধস্তুপ। কথিত আছে সম্রাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে চুরাশি হাজার স্তুপ-স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্য অশোকাবদান, থূপবংস, দীপবংস এবং মহাবংস প্রভৃতি গ্রন্থে এর সত্যতা পাওয়া যায়। সিংহলি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য মহাবংস এবং থূপবংস গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের কাছে বিশেষত মোগ্‌গলিপুত্ত স্থবিরের মুখে বুদ্ধবাণীর চুরাশি হাজার বিভাগ বা ধর্মস্কন্ধের কথা জানতে পেরে সাম্রাজ্যের চুরাশি হাজার স্থানে বিহার, স্তুপ ও স্তম্ভ নির্মাণ করেন (Jayawickrama, 1971:52)। বৌদ্ধ স্তুপ-স্থাপত্যের ইতিহাস জানার জন্য বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয় গ্রন্থ হলো থূপবংস। এ গ্রন্থে রাজা অজাতশত্রু ও সম্রাট অশোক কর্তৃক বুদ্ধের দেহাবশেষ কেন্দ্রিক স্তুপ নির্মাণের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। থূপবংস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মৌর্য সম্রাট অশোক রাজা অজাতশত্রু নির্মিত স্তুপ পুনঃউন্মোচিত করেন এবং তা হতে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ সংগ্রহ করে চুরাশি হাজার স্তুপে পুনঃবিভাজন করে সংরক্ষণ করেন। অশোকাবদান গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সম্রাট সোনা, রূপা ও বৈদূর্যে অলংকৃত চুরাশি হাজার মূল্যবান পেটিকা তৈরি করে সেখানে একটি করে দেহাবশেষ রাখেন। তাছাড়া তিনি তৈরি করেন চুরাশি হাজার 'কুম্ভ' এবং তাদের ঢাকনির জন্য চুরাশিহাজার বিভিন্ন বর্ণের 'পত্ত' (রেশমী বন্ধনী)। পরে সেগুলো জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত স্তুপে স্থাপন করা হয় (Mukhopadhaya, 1963:53)। এ চুরাশি হাজার সংখ্যা নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তা হলো, মানুষের দেহে আছে চুরাশি হাজার পরমাণু। তাই সম্রাট অশোক চেয়েছিলেন মহামানব বুদ্ধের প্রতিটি পরমাণুকে সম্মান করতে এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র জম্বুদ্বীপে তথা ভারতবর্ষে চুরাশি হাজার স্তুপ নির্মাণ করেন (বড়ুয়া, ২০০২:৩১)।

অনেক ইতিহাসবিদ চুরাশিহাজার সংখ্যাটি সাংকেতিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে একাধিকবার চুরাশিহাজার স্তুপের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে একশোর বেশি স্তুপ দেখেছেন বলে তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। হিউয়ের সাঙ যে সকল স্তুপের কথা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে তক্ষশীলায় দুইটি, কাশ্মীরে চারটি, মথুরায় তিনটি, স্থানেশ্বরে একটি, অযোধ্যায় একটি, প্রয়াগের চম্পক উদ্যানে একটি, জেতবনে তিনটি, কপিলাবস্তুতে তিনটি, লুম্বিনীতে একটি, রামগ্রামে দুইটি, কুশীনগরে একটি, সারনাথ বারাণসী বরুণা নদীর পশ্চিমে একটি, পাটলিপুত্রে দুইটি, গয়া শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে একটি, গয়ার বোধিবৃক্ষের অনতিদূরে দক্ষিণে একটি, রাজগৃহ ক্রন্দবানু বনের পূর্বে একটি, রাজগৃহ ক্রন্দবানু বনের পূর্ব স্তুপের উত্তর-পশ্চিমে একটি, নালন্দায় চারটি, পুণ্ড্রবর্ধনে একটি, সমতটে একটি, তাম্রলিপ্তে একটি, কর্ণসুবর্ণে একটি, কলিঙ্গে একটি অন্যতম (বড়ুয়া, ২০০২:৩২-৩৪; বড়ুয়া, ২০০৭:৩৪)। তবে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে ভারতের প্রাচীনতম স্তুপের মধ্যে সাঁচীস্তুপ ও ভরহুতস্তুপের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বেণীমাধব বড়ুয়া (Beni Madhab Barua) উল্লেখ করেন

যে, হিউয়েন সাঙ- এর ভারত ভ্রমণের পূর্বে প্রসিদ্ধ এ স্তূপ দু'টি শত্রুদের দ্বারা প্রভুতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং একসময় লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় (Barua, 1946:75)। সম্ভবত এ কারণে হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তূপ দুটির কথা উল্লেখ করেননি। সম্রাট অশোক নির্মিত সাঁচীস্তূপ ও ভরহুতস্তূপের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বৌদ্ধ স্থাপত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং পাথর স্থাপত্যের দুর্লভ সুপ্রাচীন নিদর্শন হলো সাঁচী স্তূপ। এটি ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভূপাল থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে বেসনগরের (পুরাতন বিদিশানগর) সন্নিকটে অবস্থিত। সম্রাট অশোক এ স্তূপটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূলত বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদগলায়ন স্থবিরের দেহধাতু বা দেহাবশেষ সংরক্ষণের জন্য। স্তূপটির উচ্চতা ১৬.৪৬ মিটার এবং ব্যাসার্দ্ধ ৩৬.৬০ মিটার। স্তূপ নির্মাণে পার্সিয়ান গ্রীক ও দেশজ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিদ্যার সম্মিলন লক্ষ করা যায় (সরকার, ১৯৯৭:৩১)। এ স্তূপটি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮২২ সালে। খননকার্য চালিয়ে স্তূপের ভেতর থেকে একটি পাথরের সম্পুটে সারিপুত্র-মৌদগলায়নের দেহাবশেষ বা অস্থি ধাতু এবং অপর একটিতে মুক্তা, স্ফটিক, পান্না, নীলা ও জীপসামের তৈরি জপমালার গুটিকা উদ্ধার করা হয়। স্তূপে আরোহণের জন্য দুই দিকে প্রসারিত দুটি সোপন আছে। দেয়াল প্রাচীরে ঘেরা স্তূপের চারদিকে চারটি অলঙ্কৃত প্রবেশদ্বার বা তোরণ রয়েছে। তোরণগুলো বুদ্ধের জীবন কাহিনী এবং জাতক কাহিনী চিত্রায়িত রিলিফ বা ফলক দ্বারা অলঙ্কৃত। রিলিফে বুদ্ধের জীবন আখ্যান চিত্রায়িত হলেও তাতে বুদ্ধকে মূর্তি দ্বারা উপস্থাপন করা হয়নি। হাতি, ঘোড়া, বোধিবৃক্ষ, চক্র, পদচিহ্ন, ছত্র, স্তূপ প্রভৃতি প্রতীকের মাধ্যমে বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতীকের মাধ্যমে বুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে। হাতি সিদ্ধার্থের মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণের প্রতীক, অনুরূপভাবে ঘোড়া গৃহত্যাগের, বোধিবৃক্ষ বুদ্ধত্বলাভের, চক্র সারনাথে প্রথম ধর্মপ্রচারের এবং স্তূপ মহাপরিনির্বাণের প্রতীক। এ কারণে ধারণা করা হয় যে, সম্রাট অশোকের সময়ে বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়নি। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ সাধন চন্দ্র সরকার ধারণা করেন তোরণগুলো বিভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়েছিল এবং দক্ষিণ তোরণটি সবচেয়ে প্রাচীন (সরকার, ১৯৯৭:৩২)। এ তোরণের অদূরে ১২.৮ মিটার উচুঁ অশোক স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ রয়েছে, যার উপরে ছিল সিংহমূর্তি। স্তম্ভের গায়ে ব্রাহ্মীলিপিতে অশোকের বাণী উৎকীর্ণ করা আছে। উল্লেখ্য যে, অশোক নির্মিত স্তম্ভের উপরে চারটি অপূর্ব সিংহমূর্তি ছিল, যা এখন ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতীক হিসেবে সমাদৃত।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়কে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলার সবচেয়ে সৃজনশীল অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পাথর কেটে গুহা-মন্দির, গুহা-চৈত্য, স্তূপের তোরণ ও রেলিং নির্মাণের সংস্কৃতি এ সময় বেশী উৎকর্ষ লাভ করে। এ সময়ে বুদ্ধগয়া, ভরহুত, সাঁচী, অমরাবতী, ভাজা, নাসিক, অজন্তা, ইলোরাসহ বিভিন্ন স্থানে নানা বৌদ্ধ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সম্রাট অশোক নির্মিত ভারতবর্ষের আরেকটি প্রসিদ্ধ স্তূপ হল ভরহুত স্তূপ। স্তূপটি মধ্যভারতের এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের মধ্যবর্তী সাতনা জেলার ভারহুত গ্রামে অবস্থিত। বহু বছর স্তূপটি জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। স্তূপটি ইষ্টক নির্মিত ছিল এবং বর্হিভাগ চূর্ণ প্রভৃতি প্লাস্টার দ্বারা আবৃত ছিল। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম সর্বপ্রথম ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্তূপটির সন্ধান পান। স্তূপটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এর আকার ও আয়তন নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান করা হয় এ স্তূপের আবেষ্টনীটি সাঁচী স্তূপের মত গোলাকার ছিল। স্তূপগর্ভে বুদ্ধের দেহাবশেষ রেখে সম্রাট অশোক স্তূপটি নির্মাণ করেন বলে পণ্ডিতগণ ধারণা করে থাকেন। এখান থেকে কয়েকটি প্রাচীর স্তম্ভ, প্রাচীরের কিছু ভগ্নাবশেষ

এবং চারটি অলঙ্কৃত তোরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। যেগুলো বর্তমানে কলকাতা জাদুঘরসহ বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ভরহুত স্তূপের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ অসাধারণ শিল্পকর্মের মধ্যে মহামায়ার স্বপ্নদর্শন- বোধিসত্ত্বের হাতির বেশে মাতৃজঠরে প্রবেশ, মার বিজয়, মহাবোধিবৃক্ষের তলে বুদ্ধত্বলাভ, স্বর্গীয় দেবতাগণ কর্তৃক বুদ্ধের কেশ-ছেদন, বুদ্ধের সাথে রাজা প্রসেনজিৎ ও অজাতশত্রুর সাক্ষাৎ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহাকপি জাতক, নলিনিকা জাতক, লট্টকা জাতক, ছদ্দন্ত জাতক, স্বর্ণমৃগ জাতক, বেস্সন্তর জাতক, মহাজনক জাতক, বিধুর পণ্ডিত জাতক প্রভৃতি জাতক কাহিনী খোদাই করে প্রস্তরগাত্র অলংকৃত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানেও বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের চরিত্রগুলো বিভিন্ন প্রতীকীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া স্তম্ভসমূহে দণ্ডায়মান অবস্থায় যক্ষ-যক্ষী দ্বারপাল মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মূর্তিগুলির আকৃতি প্রায় একরকম, কোনোটি গোল, কোনোটি ডিম্বাকৃতি, কোনোটি ঈষৎ চ্যাপ্টা। এগুলোকে ভারতীয় মূর্তিকলার প্রাণশক্তির আধার হিসেবে বিবেচনা করা হয় (সরকার, ১৯৯৭:২৩; আলম, ২০০৫:২৭৬)।

সম্রাট অশোক নির্মিত অসংখ্য স্তূপের অধিকাংশই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। অনেক স্তূপ, চৈত্য এখনো অনাবিষ্কৃত। তবে কিছু স্তূপ জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ভরহুতস্তূপ, ধামেকস্তূপ, সাঁচীস্তূপ, অমরাবতীস্তূপ, তক্ষশীলার ধর্মরাজিকস্তূপ, চৌখণ্ডী স্তূপ, নালন্দা সারিপুত্র স্তূপ, লুম্বিনী স্তূপ, কুশীনগর বা কুসীনারা স্তূপ, বৈশালী স্তূপ, শ্রাবস্তী স্তূপ। জানা যায়, সম্রাট অশোক মূলত গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত প্রায় প্রতিটি স্থানে স্তূপ-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বুদ্ধের জন্মস্থান বর্তমান নেপালে লুম্বিনী স্তম্ভ এবং স্তম্ভলিপি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে খননকাজ করে প্রাপ্ত স্তম্ভলিপি, স্তূপের ভগ্নাবশেষের মাধ্যমে লুম্বিনী তথা বুদ্ধের জন্মস্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধ সারনাথের যে স্থানে বসে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ দেশনা করেছিলেন সে পবিত্র স্থানের স্মৃতি চিরজাগরুক রাখার জন্য সেস্থানে সম্রাট অশোক ধর্মরাজিক স্তূপটি খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে নির্মাণ করেন। এই স্তূপের মধ্যে দেহভস্ম, কতিপয় মুক্তা ও স্বর্ণনির্মিত পাত্র পাওয়া গেছে (সরকার, ১৯৯৭:৪২)। অনুরূপভাবে সম্রাট অশোক তাঁর বৌদ্ধতীর্থ স্থান পরিভ্রমণকালে বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের বিভিন্ন স্থানে এবং মহাপরিনির্বাণ স্থানে শিলালিপিসহকারে স্তূপ-স্তম্ভ নির্মাণ করেন। অশোক স্তূপ স্থাপত্যের অন্যন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্তূপ গাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্ধের জীবন চরিত উপস্থাপন। বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং জাতকের কাহিনী খোদাই করে স্তূপগাত্র অলংকৃত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে স্তূপের সন্নিকটে অশোক নির্মিত নানা ধরনের স্তম্ভ এখনো অতীতের গৌরব-কীর্তি বহন করে চলেছে। অনেক স্তম্ভে শিলালিপি উৎকীর্ণ হওয়ায় সঠিকভাবে অশোকের জীবন চরিত রচনা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি বুদ্ধ জীবনের সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ খুব সহজে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে নানা বিষয়ে বির্তক নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্য পর্যটক এবং পণ্ডিতগণ যখন অশোক স্তম্ভগুলো আবিষ্কার করেন তখন এসব স্তম্ভের সৌন্দর্য ও গঠনশৈলী তাঁদেরকে মুগ্ধ করেছিল। স্তম্ভগুলোর মসৃনতা দেখে কোনো কোনো পণ্ডিত পিতলের স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত এগুলোকে মর্মরপ্রস্তরের স্তম্ভ বা ছাঁচে-ঢালাই ধাতু বলে অভিহিত করেছেন (বড়ুয়া, ২০০২:৩৬)।

সম্রাট অশোকের আরেকটি অমর কীর্তি হলো লিপি বা অনুশাসন। তাঁর উৎকীর্ণ লিপি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি আবার তিনভাগে বিভক্ত। নিন্মে চিত্রের মাধ্যমে অশোক লিপির ধরণ উপস্থাপন করা হলো:

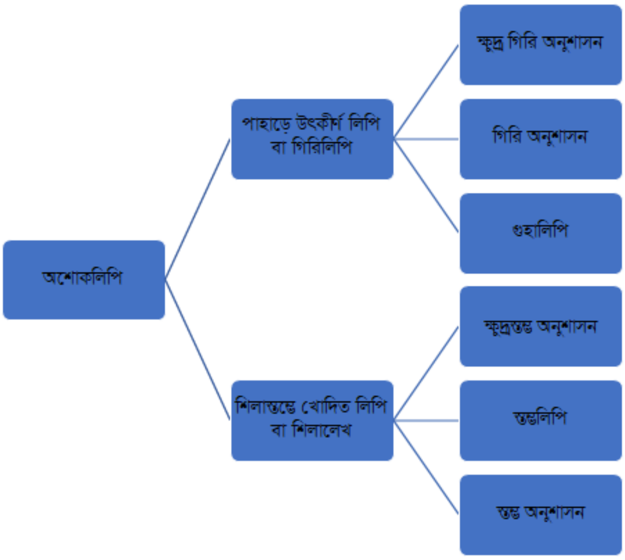

সম্রাট অশোকের উৎকীর্ণ লিপি বিশ্লেষণ করে ধর্ম, জনগণ ও রাষ্ট্রপরিচালনায় সম্রাট অশোকের মনোভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্য; পিতা-মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশনা; প্রাণীকূলের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন; ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থান নীতির সার্থক প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে সম্রাট অশোক রাজাজ্ঞা প্রদান করেন, যা অনুশাসনাকারে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। সাধারণ জনগণের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য তাঁর ছিল অকুণ্ঠ প্রয়াস। এসব কারণে অনেক ইতিহাসবিদ সম্রাট অশোককে অনুশাসনের মাধ্যমে রাজধর্ম প্রচার প্রসার করার প্রথম সম্রাট বলে অভিহিত করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকারের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> "……Asoka seems to be one of the few politicians of the world who realized that propaganda is more important than legislation in matters relating to the people's inclinations and sentiments" (Sircar, 1975: 24).

মূলত এসব শিলালিপির মূল উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা ও ধর্মপ্রচার হলেও এগুলোকে সম্রাট অশোকের জীবনী রচনার অমূল্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সপ্তম স্তম্ভলিপি এবং নেপালের তরায় অঞ্চলে অবস্থিত রুম্নিনদেবী ও নিগ্লিভা স্তম্ভের অনুশাসন থেকে জানা যায় অশোকের উপাধি ছিল দেবানম্পিয় পিয়দস্সি রাজা। অভিষেকের ১২ বছর পরে তিনি যে ধর্মীয় অনুশাসন জারি করা শুরু করেন তা অশোকের ষষ্ঠ স্তম্ভ অনুশাসন থেকে জানা যায়। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা যে তাঁর মনে গভীর মনস্তাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি করেছিল তা ত্রয়োদশ গিরি অনুশাসন থেকে জানা যায়। দ্বিতীয় কলিঙ্গ অনুশাসন প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর জনসাধারণকে নিজের সন্তানের মতো জানতেন এবং ভালোবাসতেন। এই অনুশাসনগুলো থেকে সম্রাট অশোক কর্তৃক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কূপ খনন, ছায়াদানের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপন, ঔষধিবৃক্ষ, গণ-উদ্যান এবং চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতির কথা জানা যায়। এ কারণে অশোকের শাসনামলে সংগঠিত নানা ঘটনা বা ইতিহাস জানার জন্য অনুশাসনগুলোকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ D. C. Ahir তাঁর *Asoka the Great* গ্রন্থে অশোক অনুশাসনের তথ্যবহুল একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। সে তালিকায় অনুশাসনের স্থল, অবস্থান, রাজাজ্ঞা এবং আবিষ্কারের বর্ষ সম্পর্কে গ্রন্থাকার চমকপ্রদ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অনুশাসনগুলো বিয়াল্লিশটি জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে, তন্মধ্যে ছত্রিশটি ভারতে, দুইটি নেপালে, দুইটি পাকিস্তানে এবং দুইটি আফগানিস্তানে (Ahir, 1995:172-175)। আবিষ্কৃত অনুশাসনের তথ্য নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

দেশ	অনুশাসনের ধরন	স্থানের সংখ্যা
ভারত	মুখ্য গিরি অনুশাসন	৭ টি
	ক্ষুদ্র গিরি অনুশাসন	১৮ টি
	গুহালিপি	১ টি
	মুখ্য স্তম্ভানুশাসন	৬ টি
	ক্ষুদ্র স্তম্ভানুশাসন	৪ টি
নেপাল	স্তম্ভলিপি	২ টি
পাকিস্তান	মুখ্যগিরি অনুশাসন	২ টি
আফগানিস্তান	ক্ষুদ্র গিনি অনুশাসন	২ টি

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অশোকের আরেকটি অমর কীর্তি হল অশোকারাম বিহার। মহাবংস, দীপবংস, দিব্যাবদান, মিলিন্দপ্রশ্ন, সামন্তপাসাদিকা প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিহারের কীর্তিগাথা বর্ণিত আছে। মহাবংস গ্রন্থে উল্লেখ আছে সম্রাট অশোক রাজধানী পাটুলিপুত্রে বিহারটি নির্মাণ করে ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। সামন্তপাসাদিকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এ বিহারের নির্মাণ কাজের তদারকি করেন ইন্দ্রগুপ্ত থের (Law, 1954:209)। কিংবদন্তী অনুসারে সম্রাট অশোকের ছোট ভাই তিস্‌স এ বিহারেই শ্রামণ্যধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি এখানেই বসবাস করতেন। সম্রাট অশোক এ বিহারে বসবাসরত ভিক্ষুদের প্রত্যহ আহার দান দিতেন (Chaudhury, 1982:111)। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ Vincent A Smith দাবী করেন, বিহারটি সহস্র ভিক্ষুর বসবাসের উপযোগী ছিল এবং এর অবস্থান ছিল রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। কিন্তু এটির সঠিক অবস্থান সনাক্ত করা যায়নি যা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়, কেননা সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের সময় এটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন (Smith, 2013:110)। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ মনোরম এই বিহারটি রাজগৃহের কাছে নালন্দায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ভিক্ষু নাগসেনের গুরু ধর্মকীর্তি থের এ বিহারেই বসবাস করতেন (Davids, 1890:xxv)। দিব্যাবদান গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সিংহল দ্বীপের অনুরাধাপুরে যখন ঐতিহাসিক মহাস্তূপ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল তখন অশোকারাম বিহারের এক দল বৌদ্ধ ভিক্ষু সে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ বিহারটি স্মরণীয় হয়ে আছে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আয়োজনের জন্য। দীপবংস অনুসারে তৃতীয় সংগীতি বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বৎসর পর মোগ্গলিপুত্ততিস্‌স থেরোর সভাপতিত্বে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটালিপুত্রের অশোকারাম বিহারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতিতে যে বুদ্ধবাণী 'ধর্ম-বিনয়' নামে আখ্যায়িত ছিল তৃতীয় সংগীতিতে সে 'ধর্ম-বিনয়' সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকে বিভাজিত হয়ে ত্রিপিটক নামে আত্মপ্রকাশ করে (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০১০:৫৪)। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অশোকারাম বিহার এবং সম্রাট অশোকের এ অবদান চিরভাস্বর হয়ে আছে। সিংহলী ঐতিহ্যে উক্ত আছে, সংগীতি সমাপনান্তে সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের বাইরে ধর্মপ্রচারের জন্য জ্ঞানী-গুণী ভিক্ষুদেরকে ধর্মদূত হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি সিংহলে

ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁর পুত্র মহেন্দ্র স্থবির এবং কন্যা সংঘামিত্রাকে পাঠিয়েছিলেন। জানা যায়, মহেন্দ্র স্থবির তাঁর দল নিয়ে অশোকারাম বিহার থেকে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রারাম্ভ করেছিলেন। দীপবংস এবং মহাবংস গ্রন্থদ্বয়েও এর সত্যতা পাওয়া যায়।[৪]

২.২.২. শুঙ্গ রাজবংশ (খ্রি: পূ: ১৮৭-৭৫ অব্দ)

শুঙ্গ সাম্রাজ্য ছিল মগধের একটি প্রাচীন সাম্রাজ্য, যা ১৮৭ থেকে ৭৫ খ্রিষ্টপূর্বে ভারতের উত্তর ও পূর্বভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। শুঙ্গ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। বাণভট্টের হর্ষচরিত অনুযায়ী তিনি ছিলেন মৌর্য বংশীয় শেষ শাসক বৃহদ্রথের সেনাপতি। তিনি ১৮৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শেষ মৌর্য সম্রাটকে হত্যা করে নতুন রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন (আন্তোনভা, লেভিন ও কতোভস্কি: ১৯৮২: ১০৯)। পুরাণেও পুষ্যমিত্রকে শুঙ্গ বংশীয় রাজা বলা হয়েছে। তবে দিব্যাবদান গ্রন্থে উক্ত আছে পুষ্যমিত্র ছিলেন মৌর্যবংশীয় এবং তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ৩৬ বছর রাজত্ব করেন এবং পরবর্তীতে আরো দশজন শুঙ্গ রাজা সর্বমোট ১১২ বছর রাজ্যশাসন করেন। জানা যায় শুঙ্গরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শুঙ্গদের অনুভূতি কেমন ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিত সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। দিব্যাবদান গ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে নিষ্ঠুর শাসক এবং বৌদ্ধধর্মের বিরোধী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তারনাথ পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধধর্মের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জানা যায় তিনি বৌদ্ধদেরকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন এবং বহু বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার ও স্থাপনা ধ্বংস করেন। এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুর কর্তিত মস্তকের জন্য শত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন (Raychaudhuri, 1972:345-346)। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবী করেন শুঙ্গরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারী হলেও সে সময় বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কারণ শুঙ্গ শাসনামলে নির্মিত সুন্দর সুন্দর স্থাপত্যকীর্তির অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠোদ্ধারে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

শুঙ্গ শাসনামলের বৌদ্ধ স্থাপত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ভরহুত স্তূপের সমৃদ্ধি। স্তূপটির শিল্পশৈলি ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক এ স্তূপটি সম্রাট অশোকের শাসনামলে নির্মিত হলেও এর সংস্কার ও পরিবর্ধনের কাজ শুঙ্গ শাসনামলেও চলমান ছিল। এ কারণে শুঙ্গ রাজার স্থাপত্যকর্ম ও পৃষ্ঠপোষকতার চরম নিদর্শন হিসেবে এটি স্বীকৃত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণও প্রত্ননিদর্শন বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভরহুত স্তূপটির সকল অংশ অর্থাৎ স্তূপ, বেষ্টনী, তোরণ প্রভৃতি এককালে নির্মিত হয়নি (সরকার, ১৯৯৭:২৫)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্তূপের চারটি তোরণদ্বারের মধ্যে তিনটি তোরণদ্বার শুঙ্গ শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল, যা তোরণদ্বারের স্তম্ভে শিলালিপিতে লিখিত আছে। প্রায় অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা পূর্ব তোরণটি শুঙ্গ যুগের সামন্তরাজ বাৎসীপুত্র ধনভূতির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল বলে তোরণের বামপার্শ্বস্থিত স্তম্ভে ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত আছে। তবে অনেকে ধারণা করেন যে তোরণগুলো বিভিন্ন শাসনামলে পুনর্নির্মিত কিংবা অংশবিশেষ সংযোজিত হয়েছিল। শুঙ্গ শাসনামলে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ঐ সময়ে স্তূপের বিভিন্ন অংশ নির্মাণে বিভিন্ন দাতার দান প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (সরকার, ১৯৯৭:২৫)।

ভরহুত স্তূপের মতো সাঁচী স্তূপেও শুঙ্গ শাসনামলে পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাঁচী ভারতের প্রাচীনতম পাথর নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সাঁচীর বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন বিচার-বিশ্লেষণ করে দাবী করেছেন, ভরহুত স্তূপের মতো সাঁচী স্তূপের সংস্কার ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজাদের অবদান রয়েছে। মৌর্য সম্রাট অশোক নির্মিত সাঁচীর বিশালতম স্তূপের

(১ নং স্তূপ) সাজ-সজ্জায় ও সংস্কারে শুঙ্গ রাজাদের বিশেষ অবদান রয়েছে। এ সময় স্তূপে আরোহণের জন্য দু'টি প্রশস্ত সোপন পথ, প্রদক্ষিণ পথ, বেষ্টনী, শীর্ষ ও পাদদেশের অর্ধ গোলাকার অলঙ্কৃত ফলক প্রভৃতি শুঙ্গ নৃপতিগণের রাজত্বকালেই নির্মিত ও সংযোজিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ফলকগুলো পশু-পাখি, লতা, পাতা ও মনুষ্যমূর্তিতে অলঙ্কৃত। ২য় ও ৩য় নং স্তূপের মেধি ও বেদিকা বেষ্টনীর বৈশিষ্ট্য বিচার করে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, এসবের নির্মাণ ও পরিবর্ধনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন পুষ্যমিত্র সুঙ্গের বংশধর অগ্নিমিত্র (সরকার, ১৯৯৭:৩১)।

শুঙ্গ যুগের আরেক বিস্ময়কর সৃষ্টিকর্ম হলো পাথর কেটে নির্মিত গুহা মন্দির। এগুলো সাধারণত খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়। এরূপ অসংখ্য বৌদ্ধ শিল্পকর্ম নির্মিত হয়েছিল যা উপমহাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসকে নতুন মাত্রা দান করেছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় এ অনিন্দসুন্দর গুহামন্দিরগুলোতে। গুহামন্দিরের চৈত্যগৃহ গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. রফিকুল আলম নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন :

> "চৈত্যগৃহকে স্থাপত্য না বলে বিশালাকৃতির ভাস্কর্য বলাই শ্রেয়। প্রথমে প্রধান স্থপতি গুহার নকশা তৈরি করতেন। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে কেটে বের করে আনা হতো ওপরের ছাদ। পরবর্তীকালে সেটিই সিলিং হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এরপর হাজার হাজার ফুট পাথর কেটে ভাস্কররা নির্মাণ করতেন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও ভাস্কর্য" (আলম, ২০০৫: ২৭৫)।

ভাজা গুহা খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতকে নির্মিত একটি অপূর্ব গুহা স্থাপত্য। ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের পুনা জেলার ভাজা নামক গ্রামে এই গুহার অবস্থান। এখানে আঠারটি গুহা থাকলেও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বিশাল দ্বাদশ সংখ্যক চৈত্যগুহাটি। এ চৈত্যকক্ষটি সমচতুষ্কোণ নয়, প্রান্তদেশটি অর্ধগোলাকার। চৈত্যের অভ্যন্তরে সাতাশটি স্তম্ভে ভর করা ধনুকাকৃতির ছাদ এবং উপাসনার জন্য একটি স্তূপ রয়েছে। স্তূপটি পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। বিনষ্ট হয়ে গেলেও সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, চৈত্যের ভিতরে প্রাচীর গাত্রে ফ্রেস্কো চিত্র অঙ্কিত ছিল। চৈত্যের গাত্রে খোদিত আছে চলমান চার ঘোড়ার রথ, বিশালাকৃতির নগ্ন নারী মূর্তি, নৃত্যরত দম্পতীর ভাস্কর্য প্রভৃতি। চৈত্যের বহির্ভাগও কারুকার্যময়।

২.২.৩. ইন্দোগ্রীক রাজবংশ: রাজা মিলিন্দ (খ্রি: পূ: ১১৫-৯০ অব্দ)

মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের পর গ্রীকরা উত্তর-পশ্চিম ভারত, আফগানিস্থান, পাঞ্জাব ও সিন্ধুনদের উপত্যকা অঞ্চলে একটি প্রভাবশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২:২৬৯)। ইন্দোগ্রীক সময়কার মুদ্রা হতে এ রাজ্যের ত্রিশজন শাসকের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় ইতিহাসে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত গ্রীক রাজাদের মধ্যে রাজা মিলিন্দ ছিলেন অন্যতম। ইতিহাসে যিনি মেনান্ডার, মেনান্দার, মিনান্দার নামেও খ্যাত ছিলেন। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের জন্য তিনি পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বিখ্যাত এ গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছিল রাজা মিলিন্দের বৌদ্ধধর্ম-দর্শন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন এবং ভিক্ষু নাগসেনের উত্তরের উপর ভিত্তি করে। রাজা মিলিন্দের নানা প্রশ্নের আলোকে ভিক্ষু নাগসেন বিভিন্ন যুক্তি ও উপমা সহকারে প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করেন। বৌদ্ধধর্মের গূঢ়, তত্ত্ব বিষয়ক দুর্বোধ্য বিষয়গুলো মূলত আলোচ্য গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। যেমন; আত্মা, জন্ম-মৃত্যু, নির্বাণ, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, পুনর্জম, ঋদ্ধি, কর্ম প্রভৃতি (মহাস্থবির: 1995:xxii-xxx)।

মিলিন্দ প্রশ্ন পাঠে জানা যায় রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু নাগসেনের কাছে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হন এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি ভিক্ষুসংঘের বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ করে ভিক্ষু নাগসেনকে দান করেন। মিলিন্দের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বাজাউ'র নামক স্থানে তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বছরে রচিত একটি লেখ পাওয়া গেছে, যাতে বলা হয়েছে বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন তথায় স্থাপন করা হয়েছে (হালদার, ১৯৯৬:৮০; বড়ুয়া, ২০০৭:৩৭)। মিলিন্দের পরবর্তী রাজা এবং ধনাঢ্য গ্রীকরা যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা অগাথোক্লেস তাঁর সময়ে নির্মিত মুদ্রায় বৌদ্ধস্তূপ ও পবিত্র বোধিবৃক্ষের চিহ্ন ব্যবহার করেন। সোয়াট উপত্যকা, তক্ষশীলা, সাঁচী প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান থেকে উদ্ধারকৃত শিলালিপির মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রীক রাজন্যবর্গ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গ্রীকদের দ্বারা উক্ত স্থানগুলিতে নানা ধরনের বৌদ্ধ স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু বুদ্ধমূর্তি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যা ইন্দোগ্রীক রাজন্যবর্গের শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃত (হালদার, ১৯৯৬:৮০-৮১)।

২.২.৪. কুষাণ রাজবংশ: সম্রাট কণিষ্ক (খ্রি. ১ম শতক)

কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কুজুল কদফিসেস। কুষাণদের আদি নিবাস ছিল চীন সংলগ্ন মধ্য এশিয়ার টুন-হুয়ান এবং ছি-লিয়েন পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (বর্তমান চীনের কান-সু প্রদেশ) এবং তাঁরা ছিল ইউ-চি জাতিভূক্ত (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২:৩০৬)। মৌর্য সম্রাট অশোকের পরে কুষাণ রাজবংসের নৃপতিদের মধ্যে সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের ধারণা তিনি খ্রিষ্টীয় ৭৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সফল শাসক, সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী, দূরদর্শী, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি, মুদ্রা, চীনা এবং গ্রীক ঐতিহ্য থেকে জানা যায় সম্রাট কণিষ্ক ক্ষমতায় এসে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশের পূর্বমাল (সাঁচী) অঞ্চল, পাকিস্তান, আফগানিস্থান, উজবেকিস্তান, তুর্কেমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, খিরগিজস্তান, চীনের পশ্চিমাঞ্চলে তাঘদুমবাশ, পামীর বা সুঙ লিঙ পর্বতের পূর্বদিক পর্যন্ত কণিষ্ক একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা পশ্চিমে খোরাসান হতে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে খোটান হতে দক্ষিণে কোঙ্কন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (আন্তোনভা, লেভিন ও কতোভস্কি: ১৯৮২:১৫৯-১৬০; বড়ুয়া, ২০০৭:৩৮)। সম্রাট কণিষ্কের সাম্রাজ্যে দু'টি রাজধানী এবং একাধিক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। রাজধানীগুলোর একটি বর্তমান উজবেকিস্তানের ব্যাকট্রিয়াতে এবং অন্যটি হলো পাকিস্তানের পেশোয়ারে। সম্রাট অশোকের মতো সম্রাট কণিষ্ক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যেসব কারণে অমরত্ব লাভ করেছিল তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

- সাম্রাজ্য বিস্তার।
- বহির্ভারতের চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে পৃষ্ঠপোষকতা।
- বৌদ্ধ সাহিত্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা।
- চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংগীতি আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা।
- বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর উদার নীতি।
- বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ।
- গান্ধার এবং মথুরা শিল্প-ভাস্কর্যে অবদান।

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাসে সম্রাট কণিষ্ক চিরভাস্বর হয়ে আছেন। গান্ধার এবং মথুরা শিল্প-ভাস্কর্যে পৃষ্ঠপোষকতা দান সম্রাট কণিষ্কের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক, রোমান, পারস্য শিল্প ভাস্করদের দ্বারা যে শিল্প সুষমার গোড়াপত্তন হয়েছিল তা গান্ধার শিল্পকলা নামে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বছর ধরে এ শিল্পধারার বহমানতা ছিল (নেপাল, ২০১১:৩৮)। কুষাণ আমলকে গণ্য করা হয় গান্ধারের স্বর্ণযুগ হিসেবে। আর সম্রাট কণিষ্কের শাসনামলে এ শিল্পধারা চরমভাবে সমৃদ্ধ ও উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন খুবই শিল্পানুরাগী। তিনি বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার, সংঘারাম, বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব মূর্তিসহ নানা দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধার হয়ে উঠে শিল্পকলার এক পবিত্রভূমি। সে সময়কার শিল্পকলার চরম নিদর্শন জাতক কাহিনী খোদিত বহু চৈত্য, স্তূপ ও বিহার দেখতে সুদূর চীন থেকে পরিব্রাজকেরা গান্ধার ভ্রমণে আসত। তাঁর শাসনামলে পেশোয়ারে নির্মিত একটি স্তূপ যার সৌন্দর্য দেশী বিদেশী পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, সুং-উ, হিউয়েন সাঙ এবং আরব পর্যটক আলবেরুনী এ স্তূপের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন। কিংবদন্তী অনুসারে এটি ছিল প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে উচ্চতম স্তূপ। অনুপম ভাস্কর্য সমন্বিত এ স্তূপের উচ্চতা ছিল ৬৩৮ ফুট। ১৫০ ফুট উঁচু বেদীর উপর কাঠ দ্বারা নির্মিত ৪০০ ফুট উঁচু স্তূপটি তেরতল বিশিষ্ট ছিল। এর উপর ৮৮ ফুট উচ্চতার একটি লোহার থাম ছিল। পঞ্চম শতকে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন এ স্তূপের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন এবং এ স্তূপকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্তূপ বলে উল্লেখ করেন। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণে এসে স্তূপটি ভগ্নদশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখেন বলে উল্লেখ করেন। সম্রাট কণিষ্ক পাঞ্জাবেও বুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন সম্বলিত অনেকগুলো স্তূপ নির্মাণ করেন। রাওয়ালপিণ্ডি হতে পঁচিশ মাইল দূরে পাঞ্জাবের মানিক্যালাতে অনেকগুলো কুশান স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে কুষাণামলে নির্মিত বুদ্ধমূর্তিসহ নানা ধরনের প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তূপটি আবিষ্কৃত হয়েছে এখান থেকে দুই মাইল দূরে। যেখানে চারকোণা ধাতুনিধান পাত্রের অভ্যন্তরে মুদ্রা এবং লিপি সম্বলিত একটি সম্পূট পাওয়া গেছে। লিপিতে উক্ত আছে যে কুশানরাজ কণিষ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেকের বর্ষে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ বা অস্থি ধাতু রক্ষার জন্য এই স্মারক চৈত্যটি নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া পাশ্ববর্তী এলাকায় খননকার্যের ফলে বুদ্ধের দু'টি ভগ্ন মস্তকও পাওয়া গেছে। এ কারণে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের কাছে এ স্তূপের গুরুত্ব অত্যাধিক।

স্তূপের পাশাপাশি সম্রাট কণিষ্ক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক বিহার বা সংঘারাম নির্মাণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিহারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো কণিষ্ক বিহার, কুণ্ডলবন বিহার, ষড়হৎবন বিহার, পেশোয়ারের বৌদ্ধ সংঘারাম প্রভৃতি। বিভিন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য এবং চৈনিক বৃত্তান্তে পেশোয়ারের বৌদ্ধ সংঘারামের সোনালি ইতিহাস-ঐতিহ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে এবং মধ্য এশিয়ার খোটানীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে এ মহাবিহারের কথা বর্ণিত আছে। এটি ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার মূল প্রাণ কেন্দ্র। এ বিহারকে কেন্দ্র করে ভারতীয়-গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারার একটি সমন্বিতরূপ আত্ম প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করেছিল। এ সংঘারাম বা বিহারের ধ্বংসাবশেষ পেশোয়ারের বিখ্যাত কণিষ্ক চৈত্যের পশ্চিম ভাগ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বৌদ্ধ শিল্পকলায় সম্রাট কণিষ্কের আরেকটি অমর কীর্তির নাম মূর্তিশিল্প বা ভাস্কর্যকলা। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন সময়ে খননকার্য চালিয়ে অনেক বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্বমূর্তি ও চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে গান্ধার শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিছুটা মতদ্বৈততা থাকলেও অনেক পণ্ডিত ধারণা করেন আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশের ইন্দুকুশ পর্বত গাত্রে খোদাই করা দণ্ডায়মান বুদ্ধের মূর্তিগুলো খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত

হয়েছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় প্রস্তরস্তম্ভে খোদাইকৃত ৪০ মিটার উঁচু প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিটিও সম্রাট কণিষ্কের শাসনামলের শেষের দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই গান্ধার অঞ্চলেই কুষাণদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। আদি বৌদ্ধ শিল্পের রীতি প্রতীক চিত্রণরীতি হতে সরাসরি বুদ্ধমূর্তির আবির্ভাব ঘটে। এ অঞ্চলে যে বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয় তা হেলেনিষ্টিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, বিশেষ করে রোমান মডেলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। কারণ মার্বেলে নির্মিত বুদ্ধমূর্তির গড়ন পোশাকের ভাঁজ এবং অলঙ্করণ-সবই গ্রিক দেবতা এ্যাপোলোর অনুসরণে এবং সমসাময়িক রোমান ভাস্কর্যের অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল (আলম, ২০০৫:২৮২)। সম্রাট কণিষ্ক বুদ্ধের মূর্তি ও ভাস্কর্য শুধু যে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রায়ও দণ্ডায়মান বুদ্ধের মূর্তি উৎকীর্ণ করেন। গান্ধারের ন্যায় মথুরা শিল্পকলাও সম্রাট কণিষ্কের বদান্যতায় পরিপক্কতা ও বিকাশ লাভ করেছিল। সারনাথ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বীতে কুষাণ যুগে নির্মিত অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত সারনাথ জাদুঘরে রক্ষিত ১০ ফুট উচ্চতা ও ৩ ফুট প্রশস্ত দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বমূর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কণিষ্কের পরবর্তী শাসকদের মধ্যে হুবিষ্কও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জানা যায় তিনি হুষ্কপুর নামক যে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন তা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। হিউয়েন সাঙ এ বিহারও ভ্রমণ করেন বলে অবগত হওয়া যায়। এছাড়া বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মহাবোধি মন্দির তিনি সংস্কার করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় (হালদার, ১৯৯৬:৮৮-৮৯)। সমীক্ষায় দেখা যায়, কুষাণ যুগে গান্ধার ও মথুরা শিল্পচর্চা কেন্দ্রের মাধ্যমে মূর্তিশিল্পের ব্যাপক সমৃদ্ধি সাধিত হয়।

২.২.৫. সাতবাহন রাজবংশ (খ্রিঃ পূঃ ২৩০/৩০-খ্রিঃ ৩য় শতক)

সাতবাহন রাজবংশের রাজারা ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা সিমুক। সিমুকের পরবর্তী রাজা ছিলেন কৃষ্ণ বা কণহ। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ রাজবংশের নৃপতিদের মধ্যে পুলুমায়ি এবং যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি বৌদ্ধধর্মে প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বলে বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন হতে জানা যায়। সাতবাহন নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জুন্নার, অমরাবতী, ভাজা, নাসিক, ঘন্টসাল, ভটিপ্রলু, কার্লে প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধ গুহা-মন্দির ও চৈত্য নির্মিত হয়েছিল (বড়ুয়া, ২০১৬:১২২)। ইতিহাস প্রসিদ্ধ অমরাবতী স্তূপ দক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে এবং অন্ধ্র প্রদেশের গুন্টুর জেলায় অবস্থিত। এখানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও প্রত্ন নিদর্শন বিশ্লেষণ করলে স্তূপটি নির্মাণে বিভিন্ন রাজবংশের অবদানের কথা জানা যায়। শিলালিপিতে উক্ত আছে স্তূপটি মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। স্তূপটি ভরহুত ও সাঁচী স্তূপের আদলে গড়া। এখানেও স্তূপগাত্রে বুদ্ধের জীবন কাহিনী ও জাতক কাহিনী পাথরে খোদাই করে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত আরেকটি শিলালিপি থেকে জানা যায় প্রাচীরের প্রদক্ষিণ পথ এরং স্তূপের কিছু অংশের সংস্কার ও সংযোজনের কাজ সাতবাহন রাজাদের সময়কালে হয়েছিল। লিপিতে আরো উল্লেখ আছে, সাতবাহন নৃপতি পুলুমায়ির রাজত্বকালে (খ্রিষ্টীয় ২য় শতকে) জনৈক উপাসক একটি ধর্মচক্র দান করেন (সরকার, ১৯৯৭: ৫৩)। সাতবাহন রাজাদের আরেক অমর কীর্তি হলো ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের নাসিক গুহা স্থাপত্য। এখানে কারুকার্যময় ও সুন্দর চব্বিশটি গুহাগুচ্ছ রয়েছে। অনুমান করা হয় ১৮ নং গুহাটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং এটি খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে তৈরি করা হয়েছিল। বিরাটকায় ২০ নং গুহাটি মূলত একটি বিহার। জানা যায় এটি আনুমানিক ১৭৪-২০২ খিষ্ট্রাব্দে সাতবাহন রাজ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণির রাজত্বকালের সপ্তম বর্ষে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে এর পরিবর্ধন এবং সংস্কার কাজ হয়। এখানে দণ্ডায়মান অবস্থায় বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি ও পদ্মপাণির মূর্তি রয়েছে।

২.২.৬. গুপ্ত রাজবংশ (খ্রি. ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতক)

গুপ্ত রাজবংশের অবদান ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বলা হয়ে থাকে গুপ্তদের আগমনের ফলে এ উপমহাদেশ একটি সংস্কৃতিবান শাসকগোষ্ঠী লাভ করে। মগধে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরা একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২: ৩৪৩)। গুপ্ত রাজবংশের প্রথম শাসক এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। পরবর্তীতে ঘটোৎকচ, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য, বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত প্রমুখ রাজন্যবর্গ রাজ্য শাসন করেন। মূলত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলেই প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায় এবং তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গুপ্ত নৃপতিদের শাসনামলে ও পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব বৌদ্ধ স্থাপত্যকর্ম ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছে তার কয়েকটির আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

মূর্তিশিল্প

মূর্তিশিল্প গুপ্ত শাসনামলের গৌরবনীয় কীর্তি। এ সময় বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল মথুরা ও সারনাথ। এ দু'টি কেন্দ্রে গুপ্ত শাসনামলের অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। মূর্তি নির্মাণে এ সময় চুন-সুরকি এবং বেলেপাথরের অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অপূর্ব শিল্পশৈলীর জন্য গুপ্তযুগকে উত্তর ভারতীয় শিল্পকলার 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়। মূর্তিতত্ত্ববিদগণ গুপ্তযুগের শিল্প সম্ভারকে 'ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পযুগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন (Rowland, 1967:215)। এই যুগে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তির পাশাপাশি অন্যান্য পূজ্য বৌদ্ধ সত্ত্বার ভাস্কর্যও নির্মিত হয়। মথুরার বিখ্যাত দণ্ডায়মান বুদ্ধের মূর্তিটি চতুর্থ শতকের শেষে অথবা পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত হয়েছিল। মূর্তির মাথার পেছনে খোদাই করা নকশাযুক্ত প্রভামণ্ডল রয়েছে। মূর্তি পর্যবেক্ষণ করলে শান্ত-সমাহিত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এক প্রশান্তিময় অভিব্যক্তির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এছাড়া এলাহাবাদের কাছে মনকুয়ারে প্রাপ্ত মুণ্ডিত মস্তক বুদ্ধমূর্তি গুপ্ত যুগের শৈল্পিক উৎকর্ষতার অনন্য দৃষ্টান্ত। গুপ্ত শাসনামলের আরেকটি ভাস্কর্য হচ্ছে সারনাথে প্রাপ্ত পঞ্চম শতকে নির্মিত বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। চুনার বালিপাথরে নির্মিত ভাস্কর্যটির উচ্চতা ৫ফুট ৩ ইঞ্চি। এটি গুপ্ত শিল্পকলার আদর্শ মডেল হিসেবে গৃহীত (আলম, ২০০৫:২৮৯)। মূর্তিটিতে হাত দুটি ধর্মচক্র মুদ্রায় বুকের কাছে তোলা রয়েছে। এর মাধ্যমে বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন করুণাময় রূপের প্রকাশ ঘটেছে। পেছনে রয়েছে কারুকার্যময় বিশাল প্রভামণ্ডল। প্রভামণ্ডলের দু'পাশে দু'টি উড়ন্ত দেবতা রয়েছে। এছাড়া মূর্তিটিতে হরিণ এবং প্রার্থনারত শিষ্য দ্বারা সারনাথে বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গুপ্তযুগের শেষের দিকে মূর্তি নির্মাণে ধাতব পদার্থ ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষত বিহারের নালন্দা অঞ্চলে বিশাল আকৃতির প্রচুর ধাতব পদার্থের বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়।

গুহা চিত্র

গুপ্ত শাসনামলের আরেক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বিস্ময়কর নিদর্শন হলো অজন্তার গুহা চিত্র। এটিকে বলা হয় ধ্রুপদী চিত্রকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতের মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গবাদ শহর থেকে ১০২ কিলোমিটার উত্তরে জলগাঁও রেলস্টেশনের কাছে আজিন্তা বা অজন্তা নামক গ্রামের প্রান্তে গুহামন্দিরগুলো অবস্থিত। ধারণা করা হয় গুহাগুলি দু'টি পর্যায়ে নির্মিত, প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ আরম্ভ হয়েছি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে, দ্বিতীয় পর্যায় নির্মিত হয়েছিল খ্রিষ্টীয় ৪০০-৬৫০

অব্দের মধ্যে। অজন্তায় বিশাল পর্বতের পাথর কেটে ৩০টি গুহামন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১নং, ২নং, ১৬নং, ১৭নং ও ১৯নং এ পাঁচটি গুহা গুপ্ত শাসনামলে নির্মিত হয় এবং গুহামন্দিরগুলো অপূর্ব বৌদ্ধ স্থাপনা, ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মে সুশোভিত। নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে ১নং এবং ২নং গুহা অতুলনীয়। ১নং গুহাটি একটি বিহারধর্মী গুহা। বিশটি কারুকার্যময় স্তম্ভে এবং বর্গাকৃতির হলে ভাস্কর্য ও ফ্রেস্কোচিত্রের সমন্বয় ঘটেছে। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের চিত্র ও পদ্মপাণির মূর্তি এ গুহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র ও মূর্তি। ১৭নং গুহাটিও বৌদ্ধ গুহা মন্দির। এ গুহামন্দিরকে বলা হয় অজন্তা চিত্রের স্বর্ণ-ভাণ্ডার। এর প্রাচীর গাত্রে অসংখ্য জাতক কাহিনি অঙ্কিত আছে। এ গুহার মর্মস্পর্শী ও বিখ্যাত চিত্রকর্ম হলো 'গোপা-রাহুল-বুদ্ধ' চিত্রটি। ১৯নং গুহাকে আদর্শ চৈত্যের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। এর সম্মুখভাগে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা আছে। এখানেও অসাধারণ দেয়াল চিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপনার সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংঘারাম

গুপ্ত রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত যে প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি, গৌরব ও সমৃদ্ধি সমগ্র ভারতবর্ষের পাশাপাশি বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটি হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। গুপ্তযুগের এই বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ শিক্ষার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। গুপ্ত রাজা কুমারগুপ্তের অর্থায়নে নির্মিত সংঘারামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা। পরবর্তীতে রাজা স্কন্ধগুপ্ত, জাতগত গুপ্ত, বালাদিত্য ও রাজা বজ্র এ বিদ্যায়তনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, গুপ্তরাজবংশের পাঁচজন রাজা নালন্দায় পাঁচটি সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। তন্মধ্যে বালাদিত্য সংঘারামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ৩০০ ফুট উঁচু একটি মন্দির-উপাসনালয় নির্মাণ করেন। এছাড়া নরসিংহগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের মুদ্রা ও সীলমোহর প্রাপ্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, নালন্দার সমৃদ্ধিতে গুপ্তরাজগণের আনুকূল্য ছিল (সরকার, ১৯৯৭:১৪৪; বড়ুয়া, ২০০৭:৪৩)।

৩. উপসংহার

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের জীবন-দর্শনকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ শিল্পকলার সূচনা হয়েছিল। বুদ্ধসময়কাল থেকে শুরু করে বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তায় সমগ্র ভারতবর্ষে নান্দনিক ও বিস্ময়কর বৌদ্ধ শিল্পকর্ম তৈরির সূচনা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, নানা অঞ্চলের মানুষের সৃজনশীলতা, মননশীল চিন্তা-চেতনা এবং কারিগরী দক্ষতায় বৌদ্ধ শিল্পকলা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। যুগ পরিক্রমায় বৌদ্ধ শিল্পকলা ধীরে ধীরে নানা আঙ্গিকে বিকাশ লাভপূর্বক বিশ্ব শিল্পকলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্থান করে নেয়। বুদ্ধের সময়ে শুধুমাত্র বিহার এবং স্তূপ স্থাপত্যের প্রচলন ছিল। এ সময় মূলত ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশালকায় বিহার বা সংঘারাম গড়ে উঠে। এ বিহারগুলি শুধুমাত্র ভিক্ষুদের আবাসস্থল ছিল না, এগুলো ক্রমে ক্রমে বিদ্যা চর্চার মহান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে যিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে আসেন তিনি মগধ রাজ বিম্বিসার। পরবর্তীতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা প্রমুখ রাজন্যবর্গ ও ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এ ধরনের আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। অন্যদিকে স্তূপ স্থাপত্যকর্ম সৃষ্টিতে মগধরাজ অজাতশত্রু অবদান সর্বাগ্রে স্মর্তব্য। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তিনি প্রথম বুদ্ধের দেহভস্ম সংরক্ষণে স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। শ্রদ্ধার্ঘ্য বা নৈবেদ্য নিবেদনের এটিই ছিল প্রথম স্থাপত্যকর্ম। বুদ্ধোত্তর সময়ে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক অনেক স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মিত হয়। বুদ্ধের দেহধাতু

সংরক্ষিত স্তূপ পূজার মাধ্যমে বৌদ্ধদের মাঝে পূজা-অর্চনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যা বৌদ্ধদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের পথকে প্রশস্ত করেছিল। পরবর্তীতে শুঙ্গ রাজবংশ, ইন্দোগ্রীক রাজবংশ, সাতবাহন রাজবংশ বৌদ্ধ শিল্পকলার বিকাশে অসামান্য অবদান রাখেন। কুষাণ রাজবংশের নৃপতিগণ বিশেষত সম্রাট কণিষ্ক মূর্তিশিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গুপ্তযুগে ভারতীয় মূর্তিশিল্পের চরম বিকাশ সাধিত হয় এবং এ সময়কে ভারতীয় শিল্পকলার ধ্রুপদী যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গুপ্ত শাসনামলে গুহামন্দিরের দেয়াল চিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপনা প্রাচীনকালের বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় শিল্পের উৎকৃষ্ট শৈল্পিক নিদর্শনের অপূর্ব সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া, ভাব ও ভাষার চমৎকার সম্মিলন ঘটে এই যুগের শিল্পকলায়।

টীকা

১. এ প্রসঙ্গে দীপবংস গ্রন্থে (শ্লোক নং ৫৮, তৃতীয় অধ্যায়) উল্লেখ আছে-
জাতিবস্সং মহাবীরং পঞ্চতিংস অনূনকং,
বিম্বিসার সমা তিংসা জাতবস্সো মহীপতি,
বিসেসো পঞ্চহি বস্সেহি বিম্বিসারস্স গোতমো (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০০৪:৫৪)।
অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, রাজা বিম্বিসার তখন ত্রিশ বছরে উপনীত হয়েছিলেন, বুদ্ধ বিম্বিসার অপেক্ষা পাঁচ বছরের বড় ছিলেন।

২. মহাবংস গ্রন্থে (শ্লোক নং ২৫, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) উল্লেখ আছে-
বিম্বিসারো চ সিদ্ধত্থকুমারো চ সহাযকা,
উভিন্নং পিতরো চাপি সহাযা এব তে অহুং (বড়ুয়া ও তালুকদার, ২০১১:৪৮)।
অর্থাৎ, রাজা বিম্বিসার এবং রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধ ছিলেন, উভয়ের পিতারাও তাঁদের মতো বন্ধু ছিলেন।

৩. 'ধর্মস্কন্ধ' অর্থ-ধর্ম পরিচ্ছেদ বা বিষয় বিভাগ। অর্থাৎ ত্রিপিটকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়কে এক একটি স্কন্ধ বলা হয়। ত্রিপিটকে এরূপ সর্বসাকুল্যে চুরাশি হাজার (৮৪০০০) ধর্মস্কন্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে বিনয় পিটকে একুশ হাজার (২১০০০), সূত্রপিটকে একুশ হাজার (২১০০০) ও অভিধর্ম পিটকে বেয়াল্লিশ হাজার (৪২০০০)। এই চুরাশি হাজার বুদ্ধবচন বা বুদ্ধ উল্লিখিত বিষয় বা শাস্ত্রবাক্য এই ত্রিপিটকে বিদ্যমান (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০০০:৫)।

৪. এ প্রসঙ্গে দীপবংস গ্রন্থে (শ্লোক নং ১২-১৪, দ্বাদশ অধ্যায়) উল্লেখ আছে-
মহিন্দো নাম নামেন সংঘথেরো তদা অহূ,
ইট্‌ঠিযো উত্তিযো থেরো ভদ্দসালো চ সম্বলো।
সামণেরো চ সুমনো ছলভিঞ্ঞো মহিদ্ধিকো,
ইমে পঞ্চ মহাথেরো ছলভিঞ্ঞা মহিদ্ধিকা
অসোকারামম্হা নিক্খন্তা চরমানা সহগ্গণা;
অনুপুব্বেন চরমানা বেদিস্সগিরিযং গতা (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০০৪:১২১)।
অর্থাৎ মহেন্দ্র স্থবির ছিলেন দলনেতা। তিনি ইট্‌ঠিয়, উত্তিয়, ভদ্রশাল ও সম্বল থেরকে নিয়ে যাত্রারাম্ভ করেন। তাঁদের সঙ্গী সুমন শ্রমণ ছিলেন ষড়াভিজ্ঞ সম্পন্ন ও মহাঋদ্ধিবান। ষড়াভিজ্ঞ সম্পন্ন ও মহাঋদ্ধিবান পাঁচ মহাথের অশোকারাম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করতে করতে বেদিয় পর্বত অতিক্রম করলেন।

সহায়কপঞ্জি

আন্তোনভা, কোকা ও লেভিন, গ্রিগোরি বোনগার্দ ও কতোভস্কি, গ্রিগোরি (১৯৮২) । *ভারতবর্ষের ইতিহাস*। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

আলম, ড. রফিকুল (২০০৫) । *বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা*। চয়নিকা প্রকাশনী, ঢাকা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০২) । *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)* । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

নেপাল, সুভাষ কান্তি বড়ুয়া (২০১১)। বৌদ্ধধর্ম বিকাশে কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক। *কৃষ্টি*। ২৪ বর্ষ, শুভ প্রবারণা ও কঠিন চীবর দানোৎসব সংখ্যা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অনুকুলচন্দ্র (১৯৮৯) । *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*। ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বড়ুয়া, সুকোমল ও বড়ুয়া, সুমন কান্তি (২০০০)। *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বড়ুয়া, ড. রেবতপ্রিয় (সম্পাদনা) (২০০২) । *সম্রাট অশোক*। চট্টগ্রাম।

বড়ুয়া, ড. সুমঙ্গল ও বড়ুয়া, বেলু রানী (২০০৪) । *দীপবংস*। বাংলাদেশ রিসার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা।

বড়ুয়া, ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (২০০৭)। *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি*। বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম।

বড়ুয়া, ড. সুমঙ্গল ও বড়ুয়া, বেলু রানী (২০১০) । *বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব*। পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বড়ুয়া, দিলীপ কুমার ও তালুকদার, মৈত্রী (২০১১) । *মহাবংস*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

বড়ুয়া, জ্যোতি বিকাশ (২০১৬)। *বৌদ্ধসভ্যতা ও বৌদ্ধকীর্তি: দেশে দেশে*। কাশবন প্রকাশন, ঢাকা।

মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার (১৯৯৫)। *মিলিন্দ প্রশ্ন*। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা।

সরকার, ড. সাধনচন্দ্র (১৯৯৭)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী (১৯৮৯)। *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

হালদার (দে), ড. মণিকুন্তলা (১৯৯৬)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

Ahir, D. C. (1995). *Asoka the Great*. B.R. Publishing Corporation.

Barua, Beni Madhab (1946). *Asoka and his Inscriptions*, Part 1&2, New Age Publishers Ltd., Calcutta.

Beal, Samuel (1869). *Travels of Fah-hian and Sung-Yun, Buddhist pilgrims from China to India*. Trubner and Co., London.

Chaudhury, Binayendra Nath (1982). *Buddhist Centers in Ancient India*. Sanskrit College, Calcutta.

Davids, T.W. Rhys (1890). *The Questions of King Milinda*. Part I, At the clarendon press, Oxford.

Davids, T. W. Rhys & Carpenter, J. Estlin (1903). *Dīgha Nikāya*. Vol. II, Mahā Vagga, Pali Text Society, London.

Geiger, Wilhelm (1908). *The Mahavamsa*. Pali Text Society, London.

Horner, I. B. (1946). *Buddhavaṃsa Commentary*. Pali Text Society, London.

Jayawickrama, N. A. (1971). *The Chronicle of Thupa and The Thupavamsa*. Luzac & Company Ltd. London.

Law, Bimala Churn (1954). *Historical Geography of Ancient India*. Societe Asiatique De Paris, France.

Morris, Richard (1888). *Aṅguttara Nikāya*. Vol. II Catukka Nipāta, Pali Text Society, London.

Mookerji, Radha Kumud (1943). *Chandragupta Maurya and His Times*. University of Madras.

Mukhopadhaya, S. K. (1963). *The Asokavadana*. Sahitya Akademi, New Delhi.

Malalasekera, G. P. (1998). *Dictionary of Pali Proper Names*. Vol. 1, 2, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi.

Norman, H. C. (1906). *The Commentary on the Dhammapada*. Pali Text Society, London.

Oldenberg, Hermann (1879). *Vinaya Piṭaka*. Vol. I (Mahāvagga), Pali Text Society, London.

Rowland, Benjamin (1967). *The Art and Architecture of India: Buddhist, Hindu, Jain*. Pelican History of Art, Penguin.

Raychaudhuri, H. C. (1972). *Political History of Ancient India*. Calcutta.

Smith, Helmer (1916). *Suttanipāta Commentary being Paramatthajotikā II*. Vol.1, Pali Text Society, London.

Stede, W. (1931). *Sumaṅgalavilāsinī*. Vol. II, Pali Text Society, London.

Sircar, Dr. D. C. (1975). *Inscriptions of Asoka*. Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 3rd print.

Smith, Vincent A. (2013). *Asoka The Buddhist Emperor of India*. Low Price Publication, Delhi.

Takakusu, J. (1924-34). *Taishō Shinshū Daizōkyō (Taisho No.125), Zouichi Agonkyo*, vol. 28, Daijo Shuppan, Tokyo.

Takakusu, J. and Nagai, M. (1968). *Samantapāsādikā*. Vol. III, Pali Text Society, London.

Woods, J. H. & Kosambi, D. (1922). *Papañcasūdanī*. Vol. I, Pali Text Society, London.

Walleser, M. (1924). *Manorathapūraṇī*. Vol. I, Pali Text Society, London.

Woodward, F.L. (1926). *Udāna Commentary (Paramatthadīpanī I)*. Pali Text Society, London.

Watters, Thomas (1996). *On Yuan Chwang's Travels in India*. Vol. 1, 2, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi.